সত্যাগ্রহ - স্বাধীনতা সংগ্রামে গান্ধীজীর অনন্য হাতিয়ার

অধ্যাপক সুপ্রিয় মুন্সী

দিনটা ছিল ১৫ মার্চ, ১৯১৫। কলকাতা পৌরসভা ভবনে মহাত্মা গান্ধীর জন্য আয়োজন করা হয়েছিল আরও একটি সম্বর্ধনা সভা। ভারতের এক কিংবদন্তী নেতা রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী (১৮৪৮ - ১৯২৫) যিনি কিনা দেশবাসীর কাছে 'সারেন্ডার-নট-ব্যানার্জী' বা 'বাংলার মুকুটহীন রাজা' নামেও পরিচিত ছিলেন, তিনি তাঁর ভাষণে এক সুন্দর কথা বলেন। তিনি বলেন ইতিহাসের পাতায় গান্ধীর নাম চিরস্থায়ী হবে। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১ - ১৯৪১) যেটিকে সংগ্রামে গান্ধীজীর দান বলে বর্ণনা করেছিলেন, সেই বিষয়টির কথা মনে রেখেই রাষ্ট্রগুরুর এহেন উক্তি।

সত্যি কথা বলতে কি সভ্যতার অগ্রগতির জন্য সর্বোদয় বা সর্বজনের কল্যাণ এবং এই কল্যাণসাধনে 'সত্যাগ্রহ' বা সত্যের প্রতি অবিচল নিষ্ঠার যে বার্তা মহাত্মা গান্ধী ছড়িয়ে দিয়েছিলেন তা তাঁকে ইতিহাসে অমর করেছে। শুধু তাই নয়, ২০০৭ সালের জুন মাসে রাষ্ট্রসঙ্ঘ গান্ধীজীর জন্মদিন ২ অক্টোবরকে বিশ্ব অহিংসা দিবস হিসাবে পালনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সত্যাগ্রহ শুধুমাত্র পরিবর্তনের এক হাতিয়ার নয়, এ এক গভীর জীবন দর্শন। বিভিন্ন বিরোধের মীমাংসাতেও এই অস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছে।

ভালোবাসার মাধ্যমে ঘৃনাকে জয় করার বাণী আমাদের শুনিয়েছিলেন গৌতম বুদ্ধ। কিন্তু, এখনও পর্যন্ত যে কোন বিরোধ নিরসনের ক্ষেত্রে আমরা শুধু হিংসার পথেই চলেছি। বিশ্ব জুড়ে হিংসার বিভিন্ন রূপ চোখে পড়ছে। ছোটখাটো সংঘর্ষ, সন্ত্রাসবাদ, দমনপীড়ন, শোষণ তথা বিভিন্ন ব্যক্তি, গোষ্ঠী, শ্রেণী এবং দেশের মধ্যে যুদ্ধ - সবই হিংসার প্রকারভেদ। হিংসাই হিংসার মাত্রা বাড়িয়ে এক দুষ্ট চক্র গড়ে তোলে। এক যুদ্ধের মধ্যেই শোনা যায় অন্য যুদ্ধের ডঙ্কা। হিংসা কখনোই কোন সমস্যার স্থায়ী সমাধান করতে পারেনি।

২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর এক হামলায় নিউইয়র্কের ওয়াল্ড ট্রেড সেন্টারের জোড়া মিনার ধূলিসাৎ হয়ে যায়। বিশ্ববাসী হতভম্ব হয়ে যায়। আফগানিস্তান কান্ডের প্রতিশোধ নিতেই এই হামলা। ৯৬ বছর আগে ঠিক ঐ দিনেই অর্থাৎ, ১৯০৬ সালের ১১ সেপ্টেম্বর কোন পক্ষকেই আঘাত না করে বিভিন্ন সমস্যা ও বিরোধ নিরসনের এক মানবিক পন্থার কথা বলেছিলেন মহাত্মা গান্ধী।

বিশ্ব ভারতীতে মহাত্মা গান্ধীর সম্বন্ধে এক বক্তৃতা দিয়েছিলেন গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এই বক্তৃতায় তিনি গান্ধীজীর এই পন্থার কথা সুন্দর ভাষায় তুলে ধরেছিলেন - 'সত্যের জন্য যাঁর সংগ্রাম সেই মহাত্মা গান্ধীকে আমাদের শ্রদ্ধা অর্পণ করি। নির্বিচার গণহত্যা ছাড়াও যে স্বাধীনতা অর্জন করা যায় তা তিনি দেখিয়েছেন। তিনি এই প্রথম দেখিয়েছিলেন যে কাউকে হত্যা না করে এবং অপরকে জীবনদান করে জয়লাভ করা যায়।'

এই প্রসঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকার গভর্ণর জেনারেল স্মাটস-এর কথা বলা যেতে পারে - ১৮৯৪ সাল নাগাদ দক্ষিণ আফ্রিকায় আত্মসম্মানের জন্য লড়াইয়ের বীজ রোপন করতে সংগ্রাম শুরু করেন গান্ধীজী তখন সেখানকার প্রশাসনের প্রধান ছিলেন জেনারেল স্মাট্স্। এই অসম যুদ্ধে গান্ধীজীকেই কারারুদ্ধ করা হয়। কারাগারে বসে তিনি জানতে পারেন যে জেনারেল স্মাট্সের জুতোর অসুবিধা হচ্ছে একথা জেনে নিজের হাতে এক জোড়া চপ্পল তৈরী করে জেনারেল স্মাট্সকে উপহার দেন গান্ধীজী। গান্ধীজী কোন কাজের জন্যই অপরের ওপর নির্ভর করতেন না। নিজের হাতেই তিনি অনেক কাজ করতে পারতেন। আর এজন্যই তাঁর মধ্যে ছিল এক গভীর

আত্মবিশ্বাস যা হয়ে উঠেছিল তাঁর প্রতিবাদের মূর্ত প্রতীক। ১৯৬৯ সালে গান্ধীজীর জন্ম শতবর্ষে জেনারেল স্মাটস বলেছিলেন - 'বহু গ্রীষ্মে আমি ঐ চপ্পল ব্যবহার করেছি। কিন্তু ঐ মহৎ ব্যক্তির পথ অনুসরণের শক্তি আমি অর্জন করতে পারিনি।' ১৯৪৮ সালের ৩০ জানুয়ারী গান্ধীজী নিহত হওয়ার পর নিজের অন্তরের শ্রদ্ধা জানিয়ে জেনারেল স্মাটস বলেছিলেন - 'মানুষের মধ্যে রাজপুত্রকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে।' এইভাবেই একজন শত্রুই তাঁর বন্ধু এবং কালক্রমে ভক্ত হয়ে উঠেছিলেন। তবে এটা সত্যাগ্রহের একটি দিক মাত্র। সত্যাগ্রহের আরও অনেক বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

দক্ষিণ আফ্রিকার ট্রান্সভালে এশীয়দের বিরুদ্ধে বিভিন্ন আইনকানুন জারি করা হয়েছিল। ১৮৯৭ সাল থেকে এই সমস্ত আইনকানুন, অত্যাচার ও অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ শুরু হয়ে যায়। বহু লেখালেখি হয়। ১৯০৬ সালের ২২ আগষ্ট এ সংক্রান্ত আইনের এক খসড়া সংশোধনী (ড্রাফট্ এশিয়াটিক ল অ্যামেন্ডমেন্ট) তৈরী করা হয়। এই সংশোধিত খসড়ায় প্রতিটি ভারতীয়কে বাধ্যতামূলকভাবে নিবন্ধকের শংসাপত্র নিতে বলা হয়। অন্যথা হলে তাদের জন্য জরিমানা, কারাবাস এমনকি দেশান্তরে পাঠানোরও বিধান দেওয়া হয়। গান্ধীজী বলেছেন, 'স্বাধীন মানুষের জন্য এই ধরণের কোন আইন বিশ্বের অন্য কোথাও আছে বলে আমার জানা নেই।'

এই পরিস্থিতিতে ১৯০৬ সালের ১১ সেপ্টেম্বর প্রতিবাদের পরবর্তী পদক্ষেপ স্থির করার জন্য জোহানেস্বার্গের এম্পায়ার থিয়েটারে প্রায় তিন হাজার ভারতীয় জমায়েত হন। সভায় হাজি হাবিব নামক জনৈক ব্যক্তি উঠে বলেন এই বিল পাস হলে কারাবরণ করে অহিংসভাবে তিনি প্রতিবাদ জানাবেন। তাঁর এই কথার মধ্যেই এক নতুন আলো দেখতে পান গান্ধীজী। অন্যায় আইন ও নিয়ম-কানুনের প্রতিবাদে এদিন তিনি যে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের পথ অবলম্বন করেছিলেন তা নিয়ে তিনি নিজেও খুব একটা সন্তুষ্ট ছিলেন না। কারণ, তাতে হিংসাকে পুরোপুরি বাদ দেওয়া হয়নি। তারপর, অন্যায়কারী বা প্রতিপক্ষের ক্ষতি না করে, সত্য ও ন্যায়বিচারের প্রতি অটল বিশ্বাস রেখে সংগ্রাম এবং প্রতিরোধের এক নতুন পথ খুঁজে পেলেন গান্ধীজী। 'ইন্ডিয়ান ওপিনিয়ন' -এর পাতায় এই সংগ্রামের এক উপযুক্ত নাম চাইলেন সবার কাছে। গান্ধীজীর ভ্রাতুষ্পুত্র মগনলাল গান্ধী ন্যায়বিচারের প্রতি এই আনুগত্যের নাম দেন 'সদাগ্রহ'। গান্ধীজী পরে এই নাম একটু পরিবর্তন করে রাখলেন 'সত্যাগ্রহ'। এইভাবেই জন্ম নিল অহিংস প্রতিরোধের এক যুগান্তকারী পন্থা। হিংসা, অশান্তি ও বিরোধে দীর্ণ এই পৃথিবীকে মানবিক সংগ্রাম তথা সর্বজনের কল্যাণসাধনের এই একমাত্র হাতিয়ার তুলে দিয়েছিলেন গান্ধীজী।

সত্যাগ্রহের বিভিন্ন পথ রয়েছে। অন্য পথগুলিতে কাজ না হয়ে শেষে মৃত্যু অবধি অনশনের পথ নিতে হবে। বিভিন্ন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, নৈতিক এমনকি ধর্মীয় সমস্যার সমাধানেও সত্যাগ্রহের কার্যকারিতা তুলে ধরেছিলেন গান্ধীজী। দেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের জন্য তিনি অহিংস অসহযোগ আন্দোলন (১৯২১ - ২২), লবন সত্যাগ্রহ (১৯৩০ - ৩১), আইন অমান্য আন্দোলন (১৯৩২ - ৩৪), এবং ভারত ছাড়ো আন্দোলনে (১৯৪২ - ৪৬) এই পন্থাই অবলম্বন করেছিলেন। অন্যদিকে, চাষিদের দুর্দশামোচনে ১৯১৭ সালে বিহারে চম্পারণ সত্যাগ্রহ, খেড়া সত্যাগ্রহ (১৯১৮) এবং বরদোলি সত্যাগ্রহে (১৯২৮) নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তিনি। আবার, শিল্পোবিরোধ নিরসনের ক্ষেত্রেও আমেদাবাদের কারখানা শ্রমিকদের সত্যাগ্রহের (১৯১৮) পুরোধা হয়ে উঠেছিলেন তিনি। ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা দূর করার জন্য তিনি ভাইকম্ সত্যাগ্রহের (১৯২৪) ডাক দিয়েছিলেন। সাম্প্রতিক চিপকো আন্দোলনের মধ্যেও তাঁরই আদর্শে খুঁজে পাওয়া যায়।

বিশ্ববিশ্রুত বিজ্ঞানী অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের সঙ্গে গান্ধীজীর দেখা না হলেও আইনস্টাইন ১৯৪৪ সালে গান্ধীজীর ৭৫তম জন্ম জয়ন্তীতে গান্ধীজীর প্রতি তাঁর অন্তরের শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেছিলেন তাঁর মতো একজন রক্তমাংসের মানুষ যে কখনও পৃথিবীর বুকে পদচারণা করেছেন তা জেনে বিস্মিত হবে ভাবী প্রজন্ম। ১৯৪৯ সালে বারতের

প্রথম প্রধানমন্ত্রী পন্ডিত জওহরলাল নেহেরু আমেরিকায় আইনস্টাইনের বাড়ি গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি দেখেছিলেন যে মানুষটি মনববিদ্ধংস্বী পরমাণু বোমা ও অন্যান্য মারণ বোমা তৈরির ব্রত নিয়েছেন তিনি কিভাবে নিজের ডায়রিতে গান্ধীজীর অহিংস আন্দোলনের বিশদ বিবরণ লিখে রেখেছেন। আইনস্টাইন পরে বলেছিলেন যে একমাত্র গান্ধীজীই মানব সভ্যতাকে বাঁচাতে পারেন। সত্যাগ্রহের পাশাপাশি গান্ধীজী 'গঠনমূলক কর্মসূচী' এবং 'একাদশ ব্রত'-এর নীতি মেনে চলার পরামর্শ দিয়েছিলেন সকলকে। আত্মকেন্দ্রিক, ইন্দ্রিয়পরায়ণ, ভোগবাদী ও হিংসায় ভরা যে সমাজে প্রকৃত মনুষ্যত্ব মুছে যাচ্ছে সেই সমাজের বদলে লোভহীন, শোষণহীন, স্বনির্ভর এবং সমতার আদর্শে বিশ্বাসী এক সমাজব্যবস্থা গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন গান্ধীজী।

বিশ্ব জুড়ে নিরীহ মানুষের জীবন ও সম্পত্তি হানি রুখতে ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের যোগ্য প্রত্যুত্তর হতে পারে ১৯০৬ সালের ১১ সেপ্টেম্বর যেদিন গান্ধীজী শুনিয়েছিলেন সত্যাগ্রহের কথা।